ভিশন ২০৪১ বা ‘আমরা পারি’ লক্ষ্য অর্জনের পথ

শামস্ রহমান

অর্থনীতির মানদন্ডে বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ। তাতে কার কোন সন্দেহ নেই। তবে ঠিক ততটা নয় যতটা ছিল এক যুগ পূর্বে। এ সময়ে উন্নতি হয়েছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে। নিঃসন্দেহে অনেক সমস্যা বিদ্যমান। ধর্মান্ধ অপশক্তির বার বার মাথাচাড়া দিয়ে উঠা; অনিয়ম, দুর্নীতি - বিস্তর। বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে উন্নত বিশ্বেই এসব অনেক সমস্যাই বিদ্যমান, আর তৃতীয় বিশ্বের একটি স্বল্পোন্নত দেশে সেটা থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এতদ সত্যেও, মোটেই অতিরঞ্জিত হবে না যদি বাংলাদেশের গত দশককে বর্ণনা করা হয় উন্নয়ন, অগ্রগতি, অর্জন আর সাফল্যের সময়কাল হিসেবে। আর এই সাফল্যের উপর ভর করে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। নিঃসন্দেহে এ উত্তরণ বাংলাদেশের জন্য একটি অর্থপূর্ণ মাইলফলক। এই অর্জনে গৌরব যেমন আছে, পাশাপাশি আছে চ্যালেঞ্জ। মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ় জাতীয় নেতৃত্ব, দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণ নীতি ও কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়নের ধারা বেগবান রাখতে গত এক যুগের অর্জন আর খ্যাতির উপর ভর করে ভিশন ২০৪১ বা ‘আমরা পারি’ লক্ষ্য অর্জনের কৌশল ও পন্থা কেমন হবে, সেটাই চলতি কালের প্রশ্ন?

শুরুতে বাংলাদেশের অর্জন কিছু পরিসংখানের মাঝে দেখা যাক।

‘বাস্কেট কেস্’ থেকে ‘বুল কেসে’

যে মাসে আমাদের বিজয় অর্জিত হয়, ঠিক সে মাসেই (৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) মার্কিণ প্রশাসন বাংলাদেশকে ‘বাস্কেট কেস’ বা ‘তলাবিহীন ঝুড়ি’ হিসেবে চিহ্নিত করে (South Asian Crisis, *The Foreign Relations of the United States series for 1969-1976*, Document 235, Volume XI)। তারপর হত্যার মাঝে নির্বাচিত সরকারের উৎখাতন, সামরিক অভ্যুত্থান, পালটা অভ্যুত্থান, দুঃশাসন আর কুশাসন, সেই সাথে বিকৃত ইতিহাস আর উপনবেশিক চেতনায় ঘেরা পরিবেশে কেটেছে এক লম্বা সময়।

গত একযুগের ইতিহাস ভিন্ন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সাফল্যে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল মন্তব্য করে যে বাংলাদেশ আজ আর ‘বাস্কেট কেস’ নয়, বরং ‘Bangladesh is Becoming South Asia’s Economic ‘Bull Case’ (Bird, Wall Street Journal, 3 March, 2021)। বাস্কেট কেস্ থেকে ‘বুল কেসে’ উত্তরণ মোটেই সহজ ছিল না। দৃঢ় রাজনৈতিক নেতৃত্ব আর সঠিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক পদক্ষেপে ধাপে ধাপে এসেছে এ অর্জন।

নীচে উল্লেখিত কিছু পরিসংখানেই পরিস্কার হবে আমাদের ধারণা।

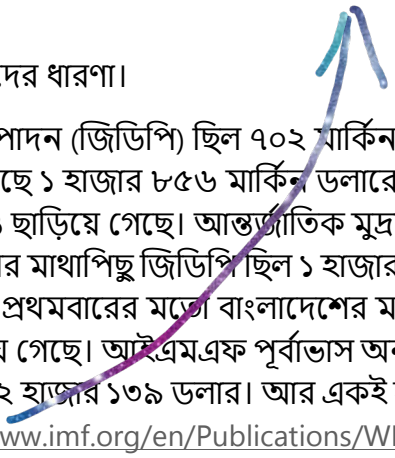

দ’হাজার নয় সনে বাংলাদেশের মাথাপিছু নমিনাল উৎপাদন (জিডিপি) ছিল ৭০২ মার্কিন ডলার। গত এক দশকে দ্বিগুণের বেশী হয়ে ২০১৯ এসে তা দাড়িয়েছে ১ হাজার ৮৫৬ মার্কিন ডলারে যা পাকিস্তান থেকে প্রায় ৩১ শতাংশ বেশী । এবং সম্প্রতি ভারতকেও ছাড়িয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসেব অনুযায়ী, ২০২০ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি ছিল ১ হাজার ৯৬১ ডলার এবং ভারতের ছিল ১ হাজার ৯২৯ ডলার। ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের মাথাপিছু নমিনাল উৎপাদন ভারতের মাথাপিছু উৎপাদন ছাড়িয়ে গেছে। আইএমএফ পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২১ সালে চলতি মূল্যে বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি হবে ২ হাজার ১৩৯ ডলার। আর একই সময়ে ভারতের মাথাপিছু জিডিপি হবে ২ হাজার ১১৬ ডলার (https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April)। উল্লেখ্য যে, মাত্র পাঁচ বছর আগেও ভারত বাংলাদেশ থেকে জিডিপিতে ২৫ শতাংশ বেশি এগিয়ে ছিল। সেই সাথে এ তথ্যও আমাদের মনে রাখতে হবে যে শ্রীলঙ্কার মাথাপিছু জিডিপি ২০২০ সালে ছিল ৩৭০০ ডলার, আর চীনের প্রায় ১১ হাজার ডলার।

২০০৯ সালে বাংলাদেশের রিজার্ভ ছিল মাত্র ৫ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি তা আজ উঠে এসেছে ৪০ বিলিয়ন ডলারের ঘরে। এর মানে, পূর্বে যেখানে বৈদেশিক মূদ্রার রিজার্ভ দিয়ে তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটাতে রাষ্ট্র হিমসিম খেত, আজ প্রায় আট মাসের আমদানি ব্যয় পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত।

বাংলাদেশের মাথাপিছু উৎপাদনের ক্রমাগত অগ্রগতির প্রতি ইঙ্গিত করে দেশের অনেক রাজনীতিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং সেই সাথে কোন কোন বিশেষজ্ঞ প্রায়ই মন্তব্য করে থাকেন যে জিডিপি 'কিছুই না' বা 'সব কিছু নয়' । অনেক রাজনীতিকদের 'কিছুই না' মন্তব্যটি ভ্রান্ত। আর এটা 'সব কিছু নয়' – সে তো অবশ্যই, আর তা সকলেই জানা । সেটাই কি স্বাভাবিক নয়? একটি মাত্র পরিমাপে কি সবকিছু মাপা সম্ভব? তবে, ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে জিডিপি অর্থনীতির পরিমাপের একটি প্রধান সূচক, তা অস্বীকার করার উপায় আছে কি?

এবার অন্য সূচকেও দেখা যাক।

জনগণের গড় আয়ু, শিক্ষা এবং জীবনযাত্রার মান, এই তিন সূচকের সমন্বয়ে গঠিত মানব উন্নয়ন সূচকেও (Human development index) বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের অবস্থানের পার্থক্য পরিষ্কার। সর্বশেষ ২০১৯ সালের কান্ট্রি-র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন সূচকের অবস্থান ছিল ১৩৩, আর পাকিস্তানের অবস্থান ছিল ১৫৪ তে। ভারত এই র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৩১ নম্বরে থেকে এখনো বাংলাদেশের ওপরে (UNDP, Human Development Report 2020, New York, US 2020)। তবে, বাংলাদেশ এবং ভারতের মাঝের দূরত্ব ক্রমশ কমে আসছে।

বিশ্ব ক্ষুধা সূচকেও প্রতি বছরই বাংলাদেশের অবস্থার উন্নতি চোখে পড়ার মত। জনসংখ্যার অপুষ্টির হারসহ চারটি মানদন্ডে গঠিত 'বিশ্ব ক্ষুধা সূচক-২০২০' প্রতিবেদনে ১০৭ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৭৫-তে। আগের তিন বছরে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল যথাক্রমে ৮৬, ৮৮ ও ৯০। এ প্রতিবেদন অনুযায়ী পাকিস্তানের অবস্থান ৮৮ তম এবং ভারতের অবস্থান ৯৪ তম (2020 Global Hunger Index by Severity, https://www.globalhungerindex.org/ranking.html)।

পাকিস্তান বা ভারতের সাথে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকের তুলনামূলক আলোচনা কোন ভাবেই দম্ভ প্রকাশের অভিপ্রায় নয়। শুধুই জানা এবং বোঝা প্রতিবেশী দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান। সব দেশই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে 'উইন-উইনে' র মনোভাব নিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়াবে এবং তাতে উপকৃত হবে উপমহাদেশের সকল সমাজ, সেটাই কাম্য।

তবে, পাকিস্তানের সাথে তুলনার অন্য একটি মাত্রা আছে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত এই ২৫ বছর পাকিস্তান অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ থেকে শোষণ করেছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার (Zillur Rahman Khan, 'March movement of Bangladesh: Bengali struggle for political power', The Indian Journal of Political Science, vol. 33, no. 3, 1972)। সেই শোষণ চালিয়ে যাওয়ায় আসক্তে মেতে উঠেছিল ১৯৭১' এ এবং নৃশংসভাবে হত্যা করেছে ৩০ লক্ষ বাংগালি। এখানেই শেষ নয়। বাঙালি জাতির প্রতি পাকিস্তানীদের মনভাব ছিল বর্ণ বৈষম্যমূলক এবং জাতিবিদ্বেষ শুলভ। সম্প্রতি পাকিস্তানি এক কলামিষ্ট দৈনিক ডন পত্রিকায় লিখেছেন - "[I] went to school during the 1950s and 1960s and grew up surrounded by unconcealed racism. Short and dark Bengalis were reputedly good only for growing jute and rice and catching fish. … as children we were made to imagine that all good Muslims and real Pakistanis are tall, fair, and speak chaste Urdu. …." (Pervez Hoodbhoy, Why Bangladesh Overtook Pakistan, Dawn, 9 Feb 2019)।

পূর্ব পাকিস্তানের বাংগালি মুসলমানদের নিম্নজাতের মানুষ এবং মুসলমান হিসেবে ভাবা শুধু যে পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারন নাগরিকদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল, তা নয়। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীও ভাবতো একই ভাবে। প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খান তার আত্মজীবনী ভিত্তিক গ্রন্থ Friends Not Masters'এ বাঙ্গালিদের "downtrodden races" বলে উপহাস করে (p. 193, Friends Not Masters, Mohammad Ayub Khan,1967)। এ কারণেই আজ কালো, বেটে ধান ফলানো আর মাছ ধরার মানুষেরা অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে লম্বা, ফর্সা খাটি মুসলমান আর পাকিস্তানিদের থেকে এগিয়ে গেছে তা বলার

তাগিদ বোধ করেছি মাত্র। তবে এটাও সত্য, শুধু এগিয়ে যাওয়াই বড় কথা নয়, এই সাফল্যকে টিকিয়ে রাখাই প্রধান বিষয়। এবং চ্যালেঞ্জটা সেখানেই।

আত্মবিশ্বাস থেকে 'আমরাও পারি'

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়ক পরিসংখ্যানগুলি শুধুই সংখ্যা নয়। কিংবা, শুধুই উন্নয়নের দৃশ্যমান কোন বস্তু নয়। এসব প্রভাব ফেলেছে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর । তা থেকে জাতির মাঝে জন্ম নিয়েছে এক ধরণের আত্মবিশ্বাস। আর আত্মবিশ্বাসের সহজ মানে – "আমরাও পারি"। অন্য অর্থে, এর মানে - অন্য দেশ বা সমাজ যা করতে পেরেছে, দেরীতে হলেও, আমরাও পেরেছি।

নিজস্ব অর্থায়নে বড় বড় অবকাঠামো নির্মাণে সক্ষমতার অপর নাম – "আমরাও পারি" । জাতির জনকের হত্যার বিচার করতে পারার অপর নাম "আমরাও পারি" । নূরেম্বার্গের মত যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধীদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর অপর নাম "আমরাও পারি" । বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ সর্বকালের (গত ২৫০০ বছরের) শ্রেষ্ট ভাষণের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির অপর নাম "আমরাও পারি" । ভারতের প্রভাবশালী দৈনিক টাইমস অব ইন্ডিয়ার ১৪ অক্টোবর ২০২০ সম্পাদকীয় নিবন্ধের শিরোনাম "Look East, India: Bangladesh is about to get past India economically. There are lessons for us" । এ শিরনামের মানেও - "আমরাও পারি" । বাংলাদেশের বালিকা শ্রমে তৈরি পোষাক উন্নত বিশ্বের হাই স্ট্রিটের ব্র্যান্ডের গায়ে 'Made in Bangladesh' শোভা পাওয়ার মানেও – "আমরাও পারি" ।

অতীতে আরও একবার 'আত্মবিশ্বাসে' জেগে উঠেছিল বাংলার মানুষ। সেটা ছিল ১৯৭০-৭১' এ। জাতির জনক "জয় বাংলা' য়" জনগণের মাঝে জাগিয়েছিল আত্মবিশ্বাস। যে আত্মবিশ্বাসে জন্মেছিল আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি। যার মাঝে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা। বর্তমান সরকারের জাগানো আত্মবিশ্বাসে ধাপে ধাপে বাংলাদেশ অর্জন করে চলেছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। তবে এটাই শেষ কথা নয়। ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নে কি কি করণীয়, তার কৌশলগত অবস্থান নেয়ার এখনই সময়।

'আমরাও পারি' থেকে 'আমরা পারি'

আগামী কুড়ি বছরে উন্নত দেশের পর্যায় পৌঁছানোর জন্য 'আমরাও পারি' থেকে 'আমরা পারি' তে উত্তরণ অপরিহার্য। 'আমরাও পারি' আর 'আমরা পারি' – দুটি বাক্যাংশ কাছাকাছি শুনালেও, তাদের মাঝের তারতম্য ও তাৎপর্য ব্যাপক। বোঝার জন্য একটি প্লাকার্ডের উদাহরণ দিচ্ছি, যা অনেকেই বাংলাদেশের গণমাধ্যম দেখেছেন। এ বছরের শুরুতে বাংলাদেশে যখন কোভিডের টিকা দেওয়া শুরু হয়, তখন প্রবাসি বাংলাদেশি এক যুবক ঢাকা ফিরে একটি প্লাকার্ড হাতে রাজপথে দাঁড়িয়েছিল। আর তাতে লিখা ছিল "কোভিড টিকা দেওয়ার জন্য বিদেশ থেকে দেশে এসেছি" । আর এই অনুভূত আত্মবিশ্বাসের ধারণাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার মানেই হচ্ছে – "আমরা পারি" । তার মানে, অন্যরা যেখানে অপারক, সেখানে আমরা সক্ষম। কোভিড টিকার ব্যাপারে দেশ হয়তো পুরপরি পারিনি বিভিন্ন বহি:স্থ কারণে, তবে নিঃসন্দেহে কোভিড টিকা প্রদানের যাত্রা একটি ইতিবাচক বিভাবের জন্ম দিয়েছিল। এ থেকেই বোঝা যায়, 'আমরাও পারি' থেকে 'আমরা পারি' উত্তরণের পথ অধিকতর কঠিন। এ উত্তরণে প্রয়োজন অবকাঠামোসহ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যপক উন্নতি সাধনের মাঝে জনগনকে 'উদ্ভাবনী মানব সম্পদে' (ইনোভেটিভ ম্যানপাওয়ার) রূপান্তরিত করা। তার জন্য শুধু মাত্র রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নয়, রাষ্ট্র কাঠামোর সকল পর্যায়ে নেতৃত্বে দূরদর্শিতা, বিচক্ষণ কৌশল ও নীতি নির্ধারণ গুরুত্বপূর্ণ।

'আমরা পারি' লক্ষ্য অর্জনের পথ

ভিশন ২০৪১ বা 'আমরা পারি' লক্ষ্য অর্জনের পথ কেমন হবে, রাষ্ট্রীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ হতে হবে তারই নিরিখে। 'আমরাও পারি এবং 'আমরা পারি' এই দুয়ের মিশ্র কৌশলে অগ্রগতির পথ খুজতে হবে। কভিডের এই দুঃসময়েই কঠিন সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। এই লক্ষ্যে এখানে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি পন্থা ও কৌশলের অবতারণা করছি।

এক) অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও বিদেশী বিনিয়োগ

গত এক দশকে দেশে স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও, এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) হয়েছে তুলনামূলকভাবে কম। ২০১৯ সালে বাংলাদেশে ২.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগের তুলনায়, ভারত, ইন্দোনেশিয়ায়, ভিয়েতনামে বিনিয়োগ হয়েছে যথাক্রমে ৫০.৬ বিলিয়ন, ২৩.৯ বিলিয়ন এবং ১৭.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশে এফডিআই প্রবাহের হার জিডিপির মাত্র ১ শতাংশ, যা এশিয়ার দেশেগুলোর প্রায় সর্বনিম্ন। কোভিড চলাকালীন সময়েও এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিদেশী বিনিয়াগ বৃদ্ধি পেয়েছে, অথচ, বাংলাদেশ প্রত্যাশিত বিনিয়াগ আকর্ষণে ব্যর্থ হয়েছে। ২০২০ সালে, যেখানে ভিয়েতনামে বিনিয়োগ হয়েছে প্রায় ১৬ বিলিয়ন, ভারতে প্রায় ৬৪ বিলিয়ন, ইন্দোনেশিয়ায় আনুমানিক ১৯ বিলিয়ন, কেম্বোডিয়া ৩.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, সেখানে বাংলাদেশে হয়েছে মাত্র ২.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (World Investment Report 2021, UNCTAD)।

বিশ্ব ব্যাংকের 'ইজ অব ডুইং বিজিনেস' ২০২০ এর সূচকে ভারতের স্থান যেখানে ৬৩, সেখানে বাংলাদেশের ১৬৮ (World Bank, Doing Business 2020)। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস সূচকেও বাংলাদেশ পিছিয়ে - ১৪১ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ১০৫এ। এতে কোন সন্দেহ নেই সরকার বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে আন্তরিক। তাই সরকারী সংস্থাগুলো বিভিন্ন উদার নীতি গ্রহণ করা সহ বিনিয়োগের একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বেশ কিছু নীতি সংস্কার ও প্রণোদনা বাস্তবায়ন করেছে। সেই সাথে বিনিয়োগ সামিট, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন, রোড শো সহ বিভিন্ন প্রচারমূলক কার্যক্রম চালিয়েছে। ২০১৯ এর সূচকের তুলনায় 'ইজ অব ডুইং বিজিনেস' ২০২০ এর সূচকে ৮ স্থান উপরে উঠেছে, তবুও মনে হচ্ছে বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনে এসব যথেষ্ট নয়। কারণ বিনিয়োগের জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত দুটি বৈশ্বিক সূচক — 'ইজ অব ডুয়িং বিজনেস' এবং গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস ইনডেক্স' এ বাংলাদেশ যথেষ্ট পিছিয়ে। ওই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান দুই অঙ্কে, অর্থাৎ ১০০- এর নিচে নামিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) কাজ করে যাচ্ছে সত্য, তবে অবস্থানের আশু উন্নয়ন আবশ্যক। যে ১০ টি বিষয় এবং ৪১ টি নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে 'ইজ অব ডুয়িং বিজনেস' এর র‍্যাঙ্কিং তৈরি হয় তা পরীক্ষা করে উন্নয়নে পদক্ষেপ নিতে হবে। সেই সাথে এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিশ্বের বহু দেশ উপমহাদেশ বলতে এখনও ভারতকেই বুঝে এবং বুঝায়। বিনিয়োগের প্রশ্ন এলে বিনিয়োগকারিরা ভারতকে ঘিরেই শুরু করে; তারপর উপমহাদেশের অন্য দেশ নিয়ে ভাবে যা ভারত ও বাংলাদেশের বিনিয়োগের পরিমাণ থেকেই প্রতীয়মান। বাংলাদেশের ভাবমূর্তির উন্নতির মধ্যদিয়ে বিদেশী বিনিয়োগকারিদের কাছে আমাদের সম্পর্কে এ ধারণা ঘোচানো জরুরী।

***প্রস্তাব ১** - বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য 'ইজ অব ডুয়িং বিজনেস' এবং 'গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস ইনডেক্স' এর অপেক্ষাকৃত দূর্বল অথচ তাৎ পর্যপূর্ণ বিষয়গুলি নির্ধারণ এবং জরুরী ভিত্তিতে সেগুলির উন্নয়নের পদক্ষেপ নেওয়া।*

দুই) শিক্ষা ও মানবসম্পদ তৈরি

অবকাঠামো, আমলাতন্ত্রিক জটিলতা, দুর্বল আর্থ-সামাজিক অবস্থা, দুর্নীতি, অনুন্নত অর্থ ও পুঁজিবাজার, জটিল কর সিস্টেম, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব, এই যাবতীয় সমস্যা বাদেও, আজ বাংলাদেশের যা সবচেয়ে বড় সমস্যা তা হচ্ছে সঠিক জনবল খুঁজে পাওয়া এবং তাদের উৎপাদনশীলভাবে কাজে লাগানো। প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণে এবং লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পাঠ্যক্রম মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণে ততটা লাগসই নয় বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। সরকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পখাতের মধ্যে যোগাযোগ এবং সহযোগিতার অভাব রয়েছে, যার নেতিবাচক প্রভাব পরছে আধুনিক শিল্পের জন্য মানসম্পন্ন ও দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির ক্ষেত্রে। অভাব পূরণের জন্য, পোশাক, টেক্সটাইল, বায়িং হাউস, টেলিযোগাযোগ, তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি শিল্প চালানোর জন্য প্রতিবেশী দেশ থেকে প্রচুর সংখ্যক বিদেশী পেশাদার এবং প্রযুক্তিবিদ

আমদানি করা হয়েছে এবং হচ্ছে, ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রতি বছর পাঁচ বিলিয়ন ডলারের অধিক অর্থ হারাচ্ছে (২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭, দি ডেইলি ষ্টার)।

সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ সম্পর্কিত প্রযুক্তির গুরুত্বের কথা বলা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু সেই সব প্রযুক্তির বাস্তবায়নের জন্য যে মানব সম্পদের প্রয়োজন, তা কিভাবে তৈরি করা যায়, সেদিকে তেমন নজর দেওয়া হচ্ছে কি? সম্প্রতি বাংলাদেশের উন্নয়ন গবেষণায় বলা হয়েছে যে ২০২৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশের বিভিন্ন খাত যেমন, তৈরি পোষাক, আইসিটি থেকে, নির্মাণ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পর্যটন, হালকা প্রকৌশল, স্বাস্থ্য সেবা, জাহাজ নির্মান আর ঔষদ তৈরি পর্যন্ত প্রায় ৭ কোটি প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত দক্ষ জনশক্তি এবং ব্যবস্থাপকের প্রয়োজন হবে (বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৯ জানুয়ারী ২০১৯)। তাহলে পাস করে শুধু সনদপ্রাপ্ত হলেই চলবে না, হতে হবে শিক্ষাপ্রাপ্ত। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রির দফতরে অবস্থিত ন্যাশনাল স্কিলস্ ডেভিলভমেন্ট কাউন্সিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে কাউন্সিল' কে ঢেলে সাজানো এবং গতিশীল করা প্রয়োজন বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

সেই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এগিয়ে আসতে হবে। সম্প্রতি বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়ের জরিপে প্রথম ৮০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে বাংলাদেশে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই জায়গা করে নিতে পারেনি। র‍্যাঙ্কিং নিয়ে বিজ্ঞজনদের নানান মত। কেউ বলেন - এর পিছনে ছুঁটার প্রয়োজন নেই। কেউ বলেন – এটা প্রাসংগিক নয়। র‍্যাঙ্কিং' এর পিছনে ছুটার প্রয়োজন নেই, তবে, শুধু র‍্যাঙ্কিং প্রাসংগিক মানদণ্ডগুলি যথার্থভাবে সম্বোধন করলে এমনিতেই র‍্যাঙ্কিং ধাপে ধাপে উপরে উঠবে। সেদিকে কি আমরা মনোযোগী? যেমন, শিক্ষাদানের মান ও পরিবেশ; গবেষণার প্রকাশিত সংখ্যা ও সুনাম এবং সাইটেশন বা গবেষণার উদ্ধৃতি, এই তিনটি মানদন্ডের দিকে নজর দিলেই যথেষ্ট। এককথায়, শিক্ষক ও গবেষকেরা গবেষণার মধ্য দিয়ে পুরোনো ও নতুন জ্ঞান অর্জন করা এবং সেই জ্ঞানটুকু শিক্ষকতার মাধ্যমে ছাত্রদের কাছে বিতরণ করা। এটুকু নিশ্চয়ই প্রাসংগিক, আর এটুকুই সমাজের চাওয়া। আর এটুকু করলেই র‍্যাঙ্কিং উপরে উঠবে। এ পন্থায় লাগসই মানব সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে একদিকে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ, অন্যদিকে বিদেশে বিনিয়োগ সম্ভব। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের প্রধান দুটি অর্থনৈতিক চালিকাশক্তির একটি 'রেমিটেন্স' , মানে বাংলাদেশী প্রবাসীদের উপার্জিত অর্থ দেশে পাঠানো, যার প্রধান উৎস মধ্যপ্রাচ্য। আজ মধ্যপ্রাচ্যে ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ প্রযুক্তির বাস্তবায়নে সেখানকার উৎপাদন এবং সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানে ধীরে ধীরে মানব সম্পদ চাহিদার পরিবর্তন ঘটছে, যার সাথে তাল মিলিয়ে মানব সম্পদ তৈরির ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করা বাঞ্ছনীয়, যদি রেমিটেন্সের পরিমাণ ধরে রাখতে কিংবা তাতে বৃদ্ধি চাই।

বাংলাদেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যায়ের সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক। গত দশ বছরে গড়ে শিক্ষাখাতে সরকারের বরাদ্দ ছিল জিডিপি' র মাত্র ১.৩, যা দক্ষিন এশিয়ার দেশের তুলনায় সবচেয়ে কম (বিশ্ব ব্যাংক, ২০২০)। তাই, বিশ্ববিদ্যালয় খাতে অর্থের জোগানে কৌশলি হওয়া অপরিহার্য। শুধু মানসম্পন্ন ও দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির জন্যই নয়, দেশে-প্রবাসে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি সৃষ্টির প্রয়াসে বাংলাদেশের অন্তত এক থেকে চারটির বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বের প্রথমসারির ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে জায়গা করে নেওয়া জরুরী। তাই পঞ্চাশটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুধু মাত্র চারটি বিশ্ববিদ্যালয় যেমন, একটি সার্বজনীন, একটি প্রকৌশলী, একটি চিকিৎসা এবং একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে শুরু হতে পারে বিশ্বের প্রথমসারির ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে জায়গা করে নেওয়ার যাত্রা। দেশে আজ যত্রতত্রভাবে উচ্চতর গবেষণা হচ্ছে, যার মান নিয়ে নিজেরাই সন্দিহান। দেশের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেই গবেষণায় চৌর্যবৃত্তির খবর প্রায়ই খবরের কাগজে দেখা যায়। তাই, দেশের উচ্চতর গবেষণার মান নিশ্চিত করার জন্য প্রস্তাবিত চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ থেকে ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী 'মাস্টার্স বাই রিসার্স' এবং পিএইচডি প্রগ্রামের শিক্ষার্থী এবং বাকি শিক্ষার্থীরা আন্ডাগ্রাজুয়েট প্রগ্রামের সাথে জড়িত থাকতে পারে। নতুন এই পন্থা অবলম্বনে অতি দ্রুত গবেষণার প্রকাশিত সংখ্যা ও সুনাম এবং সাইটেশন বাড়ানো সম্ভব যা র‍্যাঙ্কিং উত্তরণে সহায়ক হবে। আর এই প্রচেষ্টায় সফলতা এলে, তার প্রভাব পরবে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর।

***প্রস্তাব ১** - দক্ষ মানব সম্পদের অভন্তরীণ চাহিদা পূরণে ন্যাশনাল স্কিলস্ ডেভিলভমেন্ট কাউন্সিলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই, প্রয়োজনে কাউন্সিলে অবকাঠামোগত পরিবর্তন এনে ঢেলে সাজানো এবং গতিশীল করা।*

***প্রস্তাব ২** - মধ্যপ্রাচ্যে মানব সম্পদ চাহিদার পরিবর্তনের দিকে নজর রেখে এবং সেখানকার অর্থনীতিতে ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ প্রযুক্তির গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে লাগসই মানব সম্পদ তৈরির প্রয়াসে ন্যাশনাল স্কিলস্ ডেভিলভমেন্ট কাউন্সিলের কৌশল নির্ধারণ করা।*

***প্রস্তাব ৩** - শুধু মানসম্পন্ন ও দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির জন্যই নয়, দেশে-প্রবাসে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি সৃষ্টির প্রয়াসে বাংলাদেশের অন্তত এক থেকে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বের প্রথমসারির ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে জায়গা করে নেওয়া অপরিহার্য। তাই, একটি সার্বজনীন, একটি প্রকৌশলী, একটি চিকিৎসা এবং একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চিহ্নিত করণ, একাডেমিক লিডারশিপ স্থাপন, দেশ-বিদেশ থেকে মানসম্পন্ন ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করে বিশ্বের প্রথমসারির ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে জায়গা করে নেওয়ার যাত্রা শুরু করা অত্যন্ত জরুরী।*

তিন) 'ব্রেইন-গেইন' কৌশল ও মানব সম্পদ সংগ্রহ

মানব সম্পদ তৈরি একটি সময় সাপেক্ষ ব্যপার। তাই দেশের অভন্তরে মানবসম্পদ তৈরির পাশাপাশি অন্য কোন কৌশলে মানব সম্পদ আহরণ করা সম্ভব কিনা সে ভাবনাও জরুরী। সেই ভাবনা কি 'ব্রেইন-ড্রেইন' কে 'ব্রেইন-গেইন' এ রূপান্তরের কৌশল ঘিরে হতে পারে?

সন্দেহ নেই, বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে উন্নয়ন হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নদীর তলাদেশে টানেল। কিন্তু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রেই দক্ষ কর্মী সংকটে ভুগছে। দিন দিন এ সংকট বাড়ছে, যেন উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে দক্ষ কর্মী সংকট আরও তীব্রতর হচ্ছে। আজ এ সংকট মোকাবেলায় বহু প্রতিষ্ঠানই শ্রমিক আমদানী করছে প্রতিবেশী দেশ থেকে। দক্ষ শ্রমশক্তির এ সংকট শুধু প্রতিষ্ঠান চালানোর প্রতিবন্ধকতাই তৈরি করছে না, বাংলাদেশের দ্রূত প্রবৃদ্ধি অর্জনেও বাধাঁর সৃষ্টি করছে।

আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অভিবাসী বা প্রবাসী হয়ে বসবাস করছে প্রায় ১০ মিলিয়ন বাংলাদেশী। সংখ্যাটা বেশ বড়। তারা দক্ষও। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনবিদ, অর্থনীতিবিদ, কৃষিবিদ, শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক, ব্যবস্থাপনা এবং আই টি বিশেষজ্ঞ, সেবা প্রদানকারী এবং সফল ব্যবসায়ী। ভিশন ২০৪১ লক্ষ্য অর্জনে আজকের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে 'ব্রেইন-গেইন' কে বিনিয়োগের পর্যায় ভাবা যায় কি? বলাবাহুল্য, 'ব্রেইন-গেইন' কৌশল মানব সম্পদ আহরনণের এক অফূরত্ব ভান্ডার। প্রয়োজন শুধু সঙ্গবদ্ধ করে সঠিক মেধাকে সঠিক জায়গায় কাজে লাগানো। আর তা করার জন্য সরকারের নীতি-নির্ধারকদের এগিয়ে আসতে হবে।

বাস্তবায়নের জন্য উন্নত বিশ্বে অবস্থানরত বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, প্রযুক্তি, কৃষিসহ বিভিন্ন বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি Global Network of Bangladeshi Experts (সংক্ষেপে GNOBEX) গঠন করা যেতে পারে। বিশেষজ্ঞদের ডেটা-বেস এবং বিশেষজ্ঞ-টিম তৈরিতে বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশন সমন্বয়কারীর ভূমিকা নিতে পারে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেই সাথে মেগা প্রজেক্টে বিশেষজ্ঞরা টিম-বেসিসে অংশ নিতে পারে। বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত এ জাতীয় টিম উন্নত দেশের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে হার্ড এবং সফট্ উভয়ই ধরণের দক্ষতাই অতি অল্প সময়ে আমাদের অর্থনীতিতে বিকীর্ণ করা সম্ভব যা ভিশন ২০৪১ লক্ষ্য অর্জনে অত্যন্ত জরুরী। প্রবাসী বিশেষজ্ঞদের দেশের প্রতি মমত্ববোধের কারণে তাদের প্রচেষ্টায় 'মাল্টিপ্লায়ার এফেক্ট' পরিলক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল।

***প্রস্তাব ১** - ভিশন ২০৪১ লক্ষ্য অর্জনে 'ব্রেইন-গেইন' কে ইতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গিতে দেখা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আমদানি বা বিনিয়োগের বিবেচনায় নেওয়া জরুরী। ব্রেইন-গেইন' কৌশল অবলম্বনে মেধা সঙ্গবদ্ধ করে সঠিক মেধা সঠিক জায়গায় কাজে লাগানোর জন্য সরকারের নীতি-নির্ধারকদের এগিয়ে আসা বাঞ্ছনীয়।*

চার) কূটনৈতিক মিশন এবং অর্থনৈতিক কূটনীতি

দূতাবাস এবং কনস্যুলেট মিলে প্রবাসে বাংলাদেশের মিশন রয়েছে শতাধিক। মিশনগুলি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে কূটনৈতিক সুসম্পর্ক স্থাপন, সম্প্রসারন, ভিসা প্রদান, পাসপোর্ট নবায়ন, সেই সাথে নানাবিধি কাজে জড়িত থাকে। তবে এটাও হয়তো সত্য, মিশনগুলির গুরুত্ব এবং কাজের পরিধি তাদের অবস্থান বিশেষে ভিন্ন। যেমন, মধ্যপ্রাচ্যে এক ধরনের, আর পশ্চিমা দেশের ক্ষেত্রে অন্য ধরনের। আমি নিশ্চিত, যে কোন সংস্থার মত মিশনের কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন (পার্ফর্মেন্স এপ্রাইযাল) বলে মানদন্ড আছে যার নিরিখে তাদের কার্যক্রম বিন্যস্থ হয়। বাংলাদেশের ২০৪১ ভিশনকে সামনে রেখে মিশনগুলির ভূমিকার কথা বিবেচনায় নিয়ে, তাদের কার্যক্রমের বিন্যাস আর কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের মানদন্ডে পরিবর্তনের আবশ্যকিতা আছে কি? যদি থাকে, তাহলে দূতাবাসের অভন্তরীণ কাঠামোগত পরিবর্তনের আবশ্যকিতাই বা কতটুকু?

প্রশ্ন দুটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুটি দিকনির্দেশনার আলোকে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। প্রথম দিকনির্দেশনায় প্রধানমন্ত্রী অর্থনৈতিক কূটনীতির গুরুত্বের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "এক সময় আমাদের কূটনীতিটা রাজনৈতিক ছিল। এখন এটা হয়ে গিয়েছে অর্থনৈতিক, অর্থাৎ আমাদের গুরুত্ব এখন অর্থনৈতিক কূটনীতিতে" (বিডিনিউজ২৪.কম, ২২ নভেম্বর ২০১৮)। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের মানে এই নয় যে রাজনৈতিক কূটনীতির গুরুত্ব কমে গেছে। বরঞ্চ, এর মানে, রাজনৈতিক কূটনীতির সুসম্পর্কের উপর ভর করে অর্থনৈতিক কূটনীতিকে সামনে এগিয়ে নেওয়া। রাজনৈতিক কূটনীতি যে অর্থনীতির সাথে জড়িত তার দৃষ্টান্ত চীন-আষ্ট্রেলিয়া সম্পর্ক। গত পঁচিশ বছর অষ্ট্রেলিয়া চীনের সাথে 'এক ধরণের' রাজনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখে অর্থনীতি জোরদার করে। সম্প্রতি কভিড নিয়ে দু' দেশের মাঝে রাজনৈতিক জটিলতা বাড়ে এবং তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে অষ্ট্রেলিয়ার অর্থনীতিতে। অন্যদিকে, ভারতের কোয়ার্ডে অন্তর্ভুক্তি অষ্ট্রেলিয়ার সাথে ভারতের বাণিজ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

দ্বিতীয় দিকনির্দেশনা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি মিশন প্রধানদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন। তিনি বলেন, "... বিভিন্ন দেশে আমাদের অ্যাম্বাসেডর ও হাই কমিশনার যারা, তাদের একটা দায়িত্ব থাকবে যে যে দেশেই থাকেন, সেই দেশে আমাদের কোন পণ্যটা যেতে পারে, কোন পণ্যটার মার্কেট আছে সেগুলো একটু খুঁজে বের করা ..."(বিডিনিউজ২৪.কম, ২২ নভেম্বর ২০১৮)। গত সপ্তাহেই প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়টির গুরুত্বের পুনরাবৃত্তি করেন এবং বলেন, "... কী কী পণ্য আমরা উৎপাদন করতে পারি এবং রপ্তানি করতে পারি, সেটাও গবেষণা করে বের করতে হবে" (প্রথম আলো, ২৬ শে অক্টোবর, ২০২১)।

প্রধানমন্ত্রীর প্রথম দিকনির্দেশনা স্ট্রাটেজিক এবং দ্বিতীয় দিকনির্দেশনা অপেরেশনাল, যা স্ট্রাটেজিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

প্রধানমন্ত্রীর দুটি দিকনির্দেশনা অর্থবহ করার জন্য দূতাবাসের কার্যক্রম এবং কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের মানদন্ডে পরিবর্তন এবং সেই সাথে দূতাবাসের অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। মোটা দাগে, বিদেশি বিনিয়োগের সম্ভবনা, পণ্য এবং মানব সম্পদ রপ্তানির সুযোগ, পর্যটন প্রসারে সহায়ক সহ অর্থনৈতিক অন্যান্য বিষয়ের বিশ্লেষণে কোন দেশ কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা নির্ধারণ করা যেতে পারে এবং তার বিচারে নির্ধারিত হতে পারে দূতাবাসের গুরুত্ব এবং সেই সব দূতাবাসকে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনীয়তা। যেমন, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সম্প্রসারণের কারণে দূতাবাসের কমার্স উইং' কে শক্তিশালী ও সুসংহত করা। পর্যটন প্রসারের জন্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা। সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি বিদেশীদের কাছে তুলে ধরা, সেই সাথে দেশ থেকে সাংস্কৃতিক দল যেমন, সঙ্গীত ও নৃত্য, নাট্য গোষ্টি আমন্ত্রণ করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিদেশীদের জন্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেওয়া। বাংলাদেশের কোন দূতাবাস কিংবা কনস্যুলেটের অধিনে কোন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আছে কিনা আমার জানা নেই। তবে আমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের ভাবমূর্তি গড়া ও সম্প্রসারণে এর প্রভাব হবে ব্যাপক।

অস্ট্রেলিয়ার Lowy Institute, এশিয়া পাওয়ার সূচক (Asia Power Index) নামে প্রতি বছর একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে, যার উদ্দেশ্য সম্পদ এবং প্রভাব পরিমাপ করে এশিয়ার রাষ্ট্র ও অঞ্চলের আপেক্ষিক শক্তির

র‍্যাঙ্কিং নির্ধারণ করা (Asia Power Index – Key findings 2020, Lowy Institute, Sydney, 2020)। প্রধানত তিনটি বিষয় যেমন, অর্থনৈতিক সক্ষমতা (এবং তার প্রভাব), সামরিক সক্ষমতা (এবং তার প্রভাব), এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবের উপর ভিত্তি করে এই সূচক তৈরি হয়। ২০২০ রিপোর্টে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, ও ভারত সহ এশিয়ার ২৬ টি রাষ্ট্র ও অঞ্চলের র‍্যাঙ্কিং' এ বাংলাদেশের অবস্থান ১৮-তে এবং চার ক্ষমতা স্তরের বিন্যাসে বাংলাদেশ ৪র্থ স্তরে বা মাইনর ক্ষমতার দেশেগুলির অন্তর্ভুক্ত। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে এবং পররাষ্ট্র নীতির নিরিখে সামরিক সক্ষমতা (এবং তার প্রভাব) ব্যাপকভাবে বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা নেই বললেই চলে। তবে, ভিশন ২০৪১ লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি জরুরী আর সেখানেই অর্থনৈতিক কূটনীতির সংশ্লিষ্টতা্র প্রাসঙ্গিকতা। বিদেশি বিনিয়োগ, পণ্য এবং মানব সম্পদ রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে দূতাবাস গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে পারে। সেই সাথে সাংস্কৃতিক প্রভাব সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও ভুমিকা রাখতে পারে, যার প্রভাবে সৃষ্ট দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে। নীতি-নির্ধারকরা এই 'উৎকর্ষ চক্রকে' বিবেচনায় নেবে বলে আমার বিশ্বাস। উল্লেক্ষ্য, সম্প্রতি বাংলাদেশ ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে 'ট্রেড অ্যান্ড ইনভেষ্টমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক অ্যারেঞ্জমেন্ট' বা সংক্ষেপে 'TIFA' স্বাক্ষরিত হয় যা বাংলাদেশে অস্ট্রেলিয়ার বিনিয়োগের পথ সুগম করবে (বিডিনিউজ২৪ডটকম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১)। অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের দূতাবাস থেকে পূর্বে কখনো এই ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে আমার জানা নেই। TIFA'এর উদ্যোগ নেওয়া এবং তা সফলতার সাথে সম্পন্ন করার জন্য অষ্ট্রেলিয়ার দূতাবাসের হাই কমিশনার সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা সাধুবাদ পাওয়ার দাবিদার। হয়তো ইতিমধ্যে বিশ্বের অন্যান্য দূতাবাসও এই ধরণের পদক্ষেপ নিচ্ছে বা ভবিষ্যতে নেবে, সেটাই আমাদের কাম্য।

***প্রস্তাব ১** - বিদেশি বিনিয়োগের সম্ভবনা, পণ্য এবং মানবসম্পদ রপ্তানির সুযোগ, পর্যটন প্রসারে সহায়ক সহ অর্থনৈতিক অন্যান্য বিষয়ের বিশ্লেষণে কোন দেশ কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা নির্ধারণ করা এবং সেই সব দেশের দূতাবাসগুলির প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ঢেলে সাজানো প্রয়োজন।*

***প্রস্তাব ২** - ভিশন ২০৪১ লক্ষ্য অর্জনে বিদেশি বিনিয়োগ, পণ্য এবং মানব সম্পদ রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে দুতাবাসের ভুমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে, দূতাবাসগুলির অর্থনৈতিক কূটনীতি জোরদার করা জরুরী।*

***প্রস্তাব ৩** - প্রবাসে সাংস্কৃতিক প্রভাব সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে দুতাবাস উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখতে পারে, যার প্রভাবে সৃষ্ট দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে, যেমন পর্যটন খাত। নীতি-নির্ধারকদের এই 'উৎকর্ষ চক্র' বিবেচনায় নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।*

পাঁচ) তৈরি পোশাক খাত – মেইড-ইন বাংলাদেশ থেকে ব্রান্ড বাংলাদেশ

বাংলাদেশের প্রধান দুটি অর্থনৈতিক চালিকাশক্তির একটি তৈরি পোশাক খাত। আশির দশকের শুরুতে যার রপ্তানির যাত্রা শুরু হয় মাত্র ১২ হাজার ডলার দিয়ে, আজ তা গত চল্লিশ বছরে দাঁড়িয়েছে ৩১.৪৫ বিলিয়ন ডলারে। এই খাতে ৩৫০০ অধিক কারখানা সক্রিয়, যেখানে চার লক্ষ কারিগর কাজে নিয়োজিত, যাদের বেশির ভাগই নারী।

তৈরি পোশাক খাতের প্রত্যক্ষ অবদান অর্থনৈতিক হলেও, এই খাতের সামাজিক, শিক্ষা ও আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্রে পরোক্ষ অবদানও খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। যেমন, নারী ক্ষমতায়ন। গত পাঁচ দশকে নারী অধিকার আদায়ের রাজনৈতিক আন্দোলন যতটা অবদান রাখতে পেরেছে, তার চেয়ে ঢের বেশি রেখেছে তৈরি পোশাক খাত তাদের মাঝে শিক্ষা, সচেতনতা ও স্বাধীনতা বোধ সৃষ্টির মাঝে। সেই সাথে কলেজ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিড-ম্যানেজারদের ব্যবস্থাপনা-দক্ষতা অর্জনে যা অবদান রেখেছে, তার চেয়ে বেশি রেখেছে পোশাক খাত।

তবে এটা সত্য, গত চল্লিশ বছর বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত প্রধানত আন্তর্জাতিক ব্রান্ডের জন্য পোষাক তৈরি করে আসছে। বাংলাদেশের ২০৪১ ভিশনকে সামনে রেখে দীর্ঘ চার দশকের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এই খাত ভাবতে পারে কি আর এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার – From Made in Bangladesh to Brand Bangladesh? অর্থাৎ, বাংলাদেশের নিজেস্ব ব্রান্ড বিশ্ববাজারে ছাড়া। তাতে 'আমরাও পারি'

রূপান্তরিত হবে ‘আমরা পারি’ তে। তাতে অর্থ সহ সুনাম আসবে যা বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরিতে সহায়ক হবে।

নিজেস্ব ব্রান্ড তৈরিতে উদ্ভাবন ক্ষমতা বা দক্ষতা অপরিহার্য। তাই কাজটি মোটেই সহজ নয়। তবে আমাদের সামনে সে দক্ষতা অর্জনের দৃষ্টান্ত যে নেই তা নয়। যেমন চীন বা ভারত। আজও চীনকে শুনতে হয় কপিরাইট লঙ্ঘনের বদনাম। তার মাঝেই প্রযুক্তি খাতে নিজেস্ব ও অভিনব ডিজাইন নিয়ে বিশ্ববাজারে এসেছে Huawei। ভারতের বলিউড আরও একটি উদাহরণ। জেন অস্টিনের উপন্যাস অবলম্বে ইংরেজি সিনেমা Pride and Prejudice’এর আদোলে তৈরি বলিউডের Bride and Prejudice পৃথিবীর দর্শকের কাছে অনেক বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সেহেতু, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের পক্ষে বিশ্ববাজারে নিজেস্ব ব্রান্ড নিয়ে আসা অসম্ভব কিছু নয়।

প্রস্তাব ১ - দেশের ২০৪১ ভিশনকে সামনে রেখে দীর্ঘ চার দশকের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এখনই সময় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের আর এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া – From Made in Bangladesh to Brand Bangladesh। অর্থাৎ, বাংলাদেশের নিজেস্ব ব্রান্ড বিশ্ববাজারে ছাড়া।

আজ থেকে ২০৪১ কুড়ি বছর। মনে হতে পারে অনেক সময়। বাস্তবে,২০৪১ ভিশনের লক্ষ্য অর্জন, তথা উন্নত বিশ্বের দ্বার প্রান্তে পৌঁছার জন্য কুড়ি বছর তেমন দীর্ঘ সময় নয়। উন্নয়নের ভিত্তি তৈরি হয়েছে। তবে সে ধারা বেগবান করতে সঠিক কৌশল অবলম্বন করার এখনই সময়। সরকার, সরকারের নীতি নির্ধারক, বেসরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এ প্রবন্ধে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট কৌশলগুলি ইতিমধ্যে গ্রহণ করে না থাকলে, শীঘ্রই বিবেচনায় নেবেন বলে আশা করছি।

---

২ নভেম্বর, ২০২১, মেলবর্ণ